গদ্যবিগ্রহের সন্ধানে: কমলকুমার

প্রমথনাথ বিশী বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক আলোচনা করতে গিয়ে গদ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। নিছক গদ্য, গদ্যসাহিত্য আর সাহিত্যিক গদ্য। কমলকুমার মজুমদারের গদ্য আলোচনা করতে গিয়ে এই পুরনো ছকটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করার জন্য প্রথমেই মার্জনা করবেন। কিন্তু ছকের আলোচনাটা জরুরি, ছক-ভাঙাটাকে ভাল করে বুঝবার জন্যই।

প্রমথনাথ বিশীর ধারণা অনুযায়ী, নিছক গদ্য বলতে আমরা বুঝব একেবারে ভাষাগত একটি রীতি, যে রীতিতে মানুষ কথা বলে, চিঠি লেখে, আইন-আদালতের কাজ চালায়—অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত কালের পটে মর্যাদা পাওয়ার কোনও উদ্যোগ যার মধ্যে নেই। অনির্দিষ্ট শুরু থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নিছক গদ্যেরই কাল। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ঊনবিংশ শতক থেকে ওই গদ্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, দৈনন্দিনে কেজো গদ্যের কাল আজও চলেছে, কিন্তু তা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সীমানার বাইরে। নিছক কেজো গদ্যের ভিত্তি যখন এমন দৃঢ় হয় যে, মানুষের গভীর চিন্তার ভার বহন করতে পারে, স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে মননের শ্রেষ্ঠ ফসল, তখন তা গদ্যসাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই গদ্যসাহিত্যের খসড়ার কাজ শুরু হয় এবং এরই চরম বিকাশ সংবাদ ও সাময়িকপত্রের যুগে। সাহিত্যিক গদ্য বলতে বোঝানো হয়েছে সেই গদ্যকে, যার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের অনুভূতিকে বহন এবং সঞ্চরণের সামর্থ্য রয়েছে। বক্তব্যকে যে শুধু সরল ও সুশৃঙ্খল করেই প্রকাশ করে না, সুন্দরও করে তোলে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের যুগটির প্রধান গুরুত্বই এইখানে যে, তা গদ্যসাহিত্যকে সাহিত্যিক গদ্যে উন্নীত করার প্রধানতম সেতু। প্রমথনাথ বিশী লিখছেন, "গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পৌঁছতে গেলে মাঝখানে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, ওটা একেবারে অপরিহার্য। ওতে গদ্যসাহিত্যের নমনীয়তা বাড়ে। সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ে। আর সেই সঙ্গে বাড়ে সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা। এই সব শক্তি অর্জিত না হওয়া অবধি গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হতে পারে না।"

আমাদের চেনা ছকটি এইখানে এসে কমলকুমারে ধাক্কা খায়। সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া তো দূরস্থান, এমনকী মুষ্টিমেয় জনেরও যথার্থ-বোধ্য নয় কমলকুমারের গদ্য। অন্তত, দু'একবারের প্রয়াসে তো নয়ই। আবার কমলকুমারের গদ্য কথাটা অবশ্য অতি সাধারণীকরণ। বঙ্কিমি বাংলা-র মতো কমলকুমারী গদ্য নামেও কোনও বিশেষ গদ্যছাপ তৈরি করার

প্রবণতাই এই অতি সাধারণীকরণ করে। কিন্তু সেই প্রবণতা অতি বিপজ্জনক। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ওই বিশিষ্ট গদ্যটি তৈরি করে এসেছিলেন তাঁর নিজস্ব রচনা-মহলা-কক্ষে আর কমলকুমার মজুমদার নিজস্ব বিশিষ্ট গদ্যটি তৈরি করতে করতেই হয়ে উঠেছেন। সেই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও পাঠকের সামনে হাট করে খোলা। এমনকী, একটু দুঃসাহসী হয়ে একথাও বলতে চাই যে, কমলকুমারের ক্ষেত্রে তাঁর ওই নিজস্ব গদ্যও কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সহজ ভাবে হয়ে ওঠেনি, সৃষ্টির চেয়ে নির্মাণের প্রমাণ সে গদ্যের শরীরে অনেক বেশি, কখনও কখনও প্রসাধন-চিহ্নের মতোও।

বিষয়টির একটু গভীরে প্রবেশ করতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কমলকুমার আগাগোড়াই তাঁর ওই বিশেষ গদ্য লিখতেন না। প্রথম গল্প 'লাল জুতো'র একটু পড়ি—

"গৌরী সন্ধেবেলায়, প্রায় অন্ধকার বারান্দায় বসে, রূপোর ঝিনুকে করে তাকে দুধ খাওয়াবে: ঝিনুকটা রূপোর বাটিতে বাজিয়ে বাজিয়ে বলবে, আয় চাঁদ আয় চাঁদ— কি মধুর! আকাশে তখন দেখা দেবে একটি তারা।..."

এর প্রায় আড়াই দশক পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস *'অন্তর্জলী যাত্রা'*,

"বেলা যখন প্রায় লাল হইয়াছে, তখন যশোবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া সহসা কি জানি কেন গাছ পাতা নদী জলকে তাঁহার বড় পরিচিত বোধ হয়। ইহা সেই বৃদ্ধের দেখা পৃথিবী মনে হইল, তাহাদের তিনি যেন নিঃশ্বাস দান করিতেছেন। শ্মশানের বহু কিছুই তাঁহাকে বিকল করিল না, আবালবৃদ্ধবনিতা যেরূপ এ শ্মশানকে মহৎ বোধে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সেইরূপ শ্মশানকে, তাঁহার, মহৎ বোধ হইল না— এই তিনি শ্মশান দেখিলেন, আর এক প্রসূতিগৃহে যাহা কূট গতিস্পন্দনে অধীর, যাহা মৃচ্ছকটিকসদৃশ ওঙ্কার, যাহা জাতিস্মর স্তব্ধতা।"

'লাল জুতো' থেকে 'অন্তর্জলী যাত্রা', এ-ই কমলকুমারের হয়ে ওঠা। চকমকি পাথরের এক চকিত আগুন থেকে আগ্নেয়গিরির মহত্ত্বে এ-ই তাঁর সাহিত্যিক যাত্রা। কিন্তু তার পরে? 'গোলাপসুন্দরী' উপন্যাস এবং কয়েকটি খণ্ড, ছিন্ন গল্প মহাকাশে ফেটে যাওয়া রকেটের উচ্ছিষ্টের মতো কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ। তখন শুধু শব্দ নিয়ে খেলা করেন তিনি, ভাববিগ্রহটি কোথাও তাঁর নিজের দর্শনেই অস্পষ্ট থেকে যায়, কেবল গদ্য দিয়ে কাব্যবিগ্রহটি রচনা করে চলেন সুনিপুণ। 'অনিলা স্মরণে' থেকে একটু পড়ি, "সেদিন, আপনার দেহের বৈদিক সৌন্দর্য্যকে স্পর্শ করত বিরাট হল-ঘরে বসিয়াছিলেন, সে সৌন্দর্য্য অস্বচ্ছ নিপট দেওয়ালেও প্রতিবিম্বিত হয়, উহা এই রাজসিক বাড়ীর চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, সোনার গিলটি করা ফ্রেমের বিখ্যাত চিত্রগুলিও, এমনকি যে তাহার সৌন্দর্য্যদ্বারা প্রভাবান্বিত, তখন দ্বিপ্রহর, পূবে হাওয়া আনিত রৌদ্র তাঁহার অজস্র চুলে; সুদীর্ঘ পর্দ্দাগুলি মন্থরে আন্দোলিত হয়, ওপাশের খাবার ঘর হইতে কাঁচের ও ধাতুমিশ্রিত আওয়াজ আসে, তাঁহার সোনা হাতের বোনায় মুখচোরা ছোট একটি মৌ বাগান সোহাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে; লাবণ্য দেবী হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলেন, কিছু যেন।"

এ-ও সাহিত্যিক গদ্যই, কিন্তু কোনও বলার কথা, অনুভূত অনুভবের সঞ্চরণ নয়, কেবল তাঁর ওই ভাষা-প্রয়াসকেই পাঠকের সহিতত্বে আনতে চাইছেন তিনি। এ সহিতত্ব-এর প্রকৃতি আর লক্ষ্যটা ভিন্ন। সহিতত্ব কথাটা থেকে সাহিত্যের জন্ম, লেখকের মন পাঠকের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে চায় এই সহিতত্বে। শব্দেরা খেলা করে এক-একজন লেখকের নিজস্ব বাগানে, নিজস্ব কেয়ারের নিজস্ব বিন্যাসে। সব পাঠক সব বাগানে ঢোকার সহজ অধিকার সর্বত্র সহজ ভাবে পান না। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শমতো দু'তিনগুণ মনোযোগ দিলেও কমলকুমারের গোলাপবাগানে আশ্চর্য এক ভাষার কণ্টকগুলিই পাঠকের উপভোগ্য হতে পারে, নইলে তার অন্তঃসারে এক অতিশয় রোমান্টিক কাহিনি ছাড়া আর তো পাওয়ার কিছু নেই। অথবা আর এক ভাবে বলতে গেলে, এই কমলকুমারে অন্তঃসারের অনুসন্ধানটাই বৃথা। কারণ, ভাব আর ভাষা এই প্রচলিত ছকে বসিয়ে তাঁর সাহিত্যকে দেখা যায় না।

আসলে আপাত গদ্যের গঠনে শব্দ দিয়ে কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন। উপরের সবক'টি উদাহরণেই শব্দ দিয়ে ছবি এঁকেছেন কমলকুমার, শুধু রেখা-রঙের ছবি নয়, রীতিমতো ধ্বনি-গন্ধ-শব্দ মাখানো এক চলচ্চিত্রই যেন বা। কিন্তু ছবি-ভেদে দর্শকও ভিন্ন। অবশ্য দর্শক বাগানে ইতস্তত পদচারণা থেকে অরণ্যে অভিযানের অধিকার অর্জন করতেই পারেন, কিন্তু তা হতে গেলে তাঁকে কমলকুমারের পথে পথে পাথর-ছড়ানো যাত্রার সঙ্গী হতে হয়।

কিন্তু সমস্যা হল, সাধারণ পাঠক কেন আদ্যন্ত কমলকুমার পড়বেন? কেবল গদ্যের জন্য? বরং যদি বিষয়টাকে একটু উল্টো করে দেখি? যদি বলি, তাঁর যে-ভাষা তাঁকে একদিকে এক দুর্বোধ্যতার ব্র্যান্ড ইমেজ আর অন্যদিকে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের প্রতিকল্প দিল সেই ভাষাই তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসের ভিতরের অসম্ভব নূতনকে দূরে সরিয়ে রাখল সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে? ভাষার কিছু মুদ্রাদোষে লেখক হিসেবে তিনি কেবলই একা, আরও একা হতে থাকলেন?

কেবল গদ্যের জন্য কথাটা বলায় অনেকের উষ্মা তৈরি করে থাকতে পারি। সুতরাং কথাটা আরও ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন। 'মতিলাল পাদরী', 'খেলার প্রতিভা', 'তাহাদের কথা', 'মল্লিকা বাহার' এবং এমন আরও কয়েকটি ছোটগল্প, দু'একটি উপন্যাস ছাড়া আদ্যন্ত কমলকুমার অ-পাঠ্য বলেই মনে করি আমি। বরং প্রায় সবটাই শ্রাব্য এবং দৃশ্য। কারণ, সেখানে গদ্যের অতি কঠিন, কিছু-বা অসংলগ্নও, খোলস ভেদ করাই যায় না। আসলে ওটা খোলসই নয়, ওটাই তাঁর সাহিত্যের নিরেট মুক্তাফল। বরং যখন তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তখনই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'লাল জুতো' বহু দিন পরে ফিরে পড়তে গিয়ে মনে হল, একেবারে শেষে গিয়ে ওই মাতৃমূর্তির ছবিটা তৈরি করবেন বলেই যেন পুরো গল্পটা লিখলেন। তাঁর সেই প্রথম গল্পে তাঁর অননুকরণীয় ভাষারীতিটি তখনও তাঁর স্বপ্রতীক হয়ে ওঠেনি। সেই গদ্য তখনও পাঠকের কোনও বিশেষ দীক্ষা দাবি করে না। একজোড়া লাল জুতো-মাত্রকে কেন্দ্র করে নীতীশ এবং

গৌরীর যে উন্মুখতাকে কমলকুমার যে-ভাষায় ধরে রাখেন, তা বাংলা গল্পে কোনও নতুনের বার্তা বয়ে আনেনি। কিন্তু চিন্তায় কিছু নতুন বার্তা অনায়াসেই দু'একটি মুহূর্ত তৈরিতে দিয়ে রেখেছিলেন কমলকুমার। বাংলা গল্পে স্পর্শযোগ্য অথচ অনুচ্চারিত যে যৌনতা প্রায় অতি বিরল তার কিছু চিহ্ন ছিল ওই গল্পে। যেমন, "একদা স্নানের পর তাঁড়াতাড়ি করে নীতীশ ভাত খেতে গেছে, ঠাকুমা বললেন, —নীতীশ তোর পিঠময় যে জল, ভাল করে গাটাও মুছিস নি? পাশেই গৌরী দাঁড়িয়েছিল, সে অমনি আঁচল দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিলে পরম স্নেহে— অবশ্য নীতীশ তখন ভীষণ চটেছিল।" এমত যে সম্ভাবনা তাকে কোন ব্যর্থতায় সমাপন করলেন কমলকুমার? শেষাংশের কয়েকটি লাইন পড়লেই বুঝতে পারা যাবে, "গৌরীর হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, ওই লাল জুতো পরে, নীতীশ টলমল করে চলল, আর— গৌরী চলতে শুরু করলে, নীতিশের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে। আচম্বিতে সশব্দে জুতোজোড়াকে চুম্বন করলে। তারপর নীতীশের দিকে চেয়ে, ঈষত্ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে জিগগেস করলে কার জন্যে গো?" একেবারে শেষে, "হ্যা— অসভ্য, বলে গ্রীবাটাকে পাশের দিকে ফিরিয়ে নিজের মধুর লজ্জাটা অনুভব করলে। লাল জুতোজোড়া তখনও তার কোলে, যেন মাতৃমূর্তি।"

বস্তুত, এই মাতৃমূর্তি এবং এই জাতীয় কিছু ধারণার ছক এবং তাকে ঘিরে সমালোচকগণের আদিখ্যেতা লেখকের নিরপেক্ষ, পরিষ্কার পাঠে বেশির ভাগ সময়েই বিপত্তি ঘটায়। ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এই বিপদটি ঘটেছে, এবং প্রায়শ ঘটে থাকে কমলকুমার মজুমদারের গদ্যপাঠে। ধারণার ছকে সবচেয়ে বড় কথা হয়ে দাঁড়ায় কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যে একাই এক প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র ও স্বমহিম, অনন্য ও অভিজাত। ঠিক এভাবেই লেখা হতে থাকে কমলকুমার মজুমদারের গল্পসমগ্র-এর ব্লার্ব, 'কল্লোল-কালিকলম, বা পরিচয় পত্রিকা থেকে উদ্ভূত লেখককুলেরই সমসাময়িক কমলকুমার। কিন্তু তাঁকে কোনও-একটি বিশেষ পত্রিকা দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। কমলকুমারকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে লেখকগোষ্ঠী, অথচ তিনি কোনও গোষ্ঠীর লেখক নন।' এমত প্রশস্তিবচন লেখার সময় আমরা একবারও ভেবে দেখি না, কোনও স্থায়ী-নাম লেখকই শেষ পর্যন্ত কোনও বিশেষ পত্রিকায় চিহ্নিত হয়ে থাকেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কোন পত্রিকা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা কোন পত্রিকার? আর, কমলকুমারকে ঘিরে লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে একথাটিরই বা সত্যতা কোথায়? কফি হাউসে কিংবা খালাসিটোলায় কমলকুমারকে ঘিরে লেখকেরা থাকতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভাবনা বা রীতিকে অনুসরণ করেছেন কিংবা সেই বীজ বুকে নিয়ে নতুন ফসলের জন্ম দিয়েছেন, এমন একজন লেখকেরও কি নাম করা যাবে?

যাবে না। কারণ, ওটা কমলকুমারের কোনও সচেতন সাহিত্য-প্রয়াস নয়, ওটা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অংশ। ব্যক্তিত্ব মানে কিছু রসিক গালগল্পের সমাহার নয়, এক ধরনের মন্ত্রিত আবেশে ঋদ্ধ হয়ে থাকা এক অস্তিত্ব, যাকে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো করে 'উন্মত্তবৎ'ও বলা যায়। বিহারীলালের ওই উন্মত্ততার নেপথ্যে কোনও আত্যন্তিক বঙ্গ-দর্শন ছিল না,

তাই তা নেহাত লঘু কবিতা-প্রয়াস। স্মৃতি আর দেশজতায় মিশে কমলকুমারে তৈরি হয়েছিল এক নিজস্ব বঙ্গ-দর্শন, যা তিনি কখনও শেয়ার করতে চাননি আম পাঠকের সঙ্গে। হয়তো তাই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-অনুযায়ী, কখনও কখনও তিনি বলেছেন— সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা, তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়। সারদা-বিরহে উন্মত্তবৎ ওই ঘোরটায় না থাকলে যেমন বিহারীলালকে বোঝা যায় না, তেমনই ওই সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলার অবস্থাটা না বুঝলে কমলকুমারকে বোঝা যায় না।

অথচ কমলকুমার এখনও আমাদের কাছে সাধারণ ভাবে এক ধরনের না-বোঝা প্রশস্তি, যার অনেকটাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপন-নির্ভর, এক অর্থে যে যাপন-গল্প কমলকুমারেরই সর্বনাশ করেছে। কফি হাউসে কাউকে পাঁচটা ডিম একসঙ্গে খেতে দেখে কমলকুমার পাঁচটা মেয়েমানুষ রাখতে বলেছিলেন কি না, কোন সাহেবকে তিনি ফর্সা ভদ্রলোকটি বলে উল্লেখ করেছিলেন সেই সব গল্পে বাঙালির মতি এতটাই যে, তার চাপে লেখক কমলকুমার হারিয়ে গিয়েছেন। অথচ 'অন্তর্জলী যাত্রা' কিংবা 'খেলার প্রতিভা', 'মল্লিকা বাহার' কিংবা 'মতিলাল পাদরী'র মতো গল্পে সত্যিই বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন যুগের সম্ভাবনা এনেছিলেন কমলকুমার। সাহিত্য-সমালোচকেরা যতই তার শাঁস-জলের বৃথা অনুসন্ধান করলেন, তাঁর গদ্যের কাব্যবিগ্রহটি উদ্ঘাটন করতে যত ব্যর্থ হতে থাকলেন, তত কমলকুমারকে আচ্ছন্ন করে দিলেন বিবিধ ব্যক্তিক গল্পে এবং কমলকুমার হয়ে উঠলেন সাহিত্যে এক অসেতুবন্ধ দ্বীপমাত্র। আর তার ফল যে কী হয়েছে তা অসামান্য আন্তরিকতায় লিখেছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—

"কমলকুমার মজুমদারের আসর দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে এল। লোক ওঠা শুরু হয় সেই অনিলা-স্মরণে থেকে, এখন আসর প্রায়-ফাঁকা, আজ, সুহাসিনীর পমেটম-এর পর, পিছন থেকে, সামনে থেকে, যত্রতত্র থেকে লোক উঠে যাচ্ছে। অন্তর্জলি যাত্রা ও নিম অন্নপূর্ণা যখন পুস্তকাকারে বেরোয়, সেই ছিল তাঁর সুসময়, তখন তাঁর পাঠকসংখ্যা ছিল সুদীর্ঘ— যেমন একটা শালগাছ— তারপর আজ কমলকুমার মজুমদারের পাঠক সশব্দে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। সুহাসিনীর পমেটম মাত্র ২০জন পাঠকও পেয়েছিল কি না সন্দেহ, আমাকে পায়নি।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে সহসা খানিকটা ফাঁকা জায়গা যেখানে সরলরেখার মতো পড়ে আছে ওই শালগাছ, —কমলকুমার মজুমদারের পাঠক, তার বুকে কুড়াল, আজ থেকে মাত্র দশ বছর পরে এই দৃশ্য। দশ বছর পরে কমলবাবুর কোনো পাঠক নেই, মিথ্যাবাদী ছাড়া আজ মার্শেল প্রুস্তেরও নেই কোনো পাঠক, কিংবা, যেমন ফিনগানস্ ওয়েক, যা আজ কিংবদন্তী। 'যদি ডাবলিন কখনো ধ্বংস হয়ে যায়, আমার ইউলিসেস থেকে অবিকল ডাবলিন তৈরি করা যাবে...' বৃথা গর্ব করে একথা জয়স একদিন বলেছিলেন।

কিন্তু এতে জয়স বা প্রুস্তের কিছু এসে যায়নি। ...এতে কমলবাবুর কিছু এসে যাবে না; যে কমলকুমার মজুমদার পড়েনি, কলকাতা তাকে শিক্ষিত মনে করে না, কলকাতার বাইরে, প্রাদেশিক লেখকমহলে; উনিই এখন কিংবদন্তী— এ জন্য নয়। কেননা একথা

আমরা এখন জানি যে, কমলকুমার মজুমদার একজন সাধক, যেমন সাধনা ছিল একমাত্র বঙ্কিমের বা বালুকাস্তূপের উপর শবারূঢ় সেই মনুষ্যমূর্তির, যার সামনে ছিল নরকপাল, চতুর্দিকে ছিল অস্থি ও দুর্গন্ধ, সমুখের অগ্নির প্রভায় যাকে, নবকুমারের, আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় মনে হয়েছিল।"

শতবর্ষে কমলকুমারের গদ্যকে আমরা সেই আকাশপটস্থ চিত্র করেই রাখব, না আজকের এই সংযোগ-সর্বস্ব বাংলা ভাষার দীনতায় এক নতুন উড়ানের উল্লাস হিসেবে স্বীকার করে তার ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হব, সে বিচার অবশ্য একান্ত আমাদের।